সিরাজাম-মুনীরা

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

সিরাজাম-মুনীরা

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৯০২৮১৮৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ

ফেব্রুয়ারী	২০১৫ ঈসায়ী
মাঘ	১৪২১ বাংলা
রবিউস সানি	১৪৩৬ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭৮৪-৪৭৩৫৮৬

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র

SIRAZAM MUNIRA : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-9028188, website : www.khasmujaddidia.org. **Price : Tk. 20.00 Only.**

লেখকের অন্যান্য বই :

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খন্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খন্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খন্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)

২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা
২৯. আল-কুরআন : কালামুল্লাহ
৩০. প্রবন্ধ-ত্রয়ী
৩১. কিয়ামত!?
৩২. ইল্‌মে তাসাওফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
৩৩. হুব্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব
৩৪. মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওহাব নজ্‌দী ও তাঁর মতবাদ
৩৫. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (অনুবাদ গ্রন্থ : ই.ফা.বা.)
৩৬. মহানবী (সা.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ (নাদরাতুন নাঈম) : অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ সদস্য, ই.ফা.বা.।
৩৭. শয়তানের শয়তানী!
৩৮. আল্লাহ্‌র গযব যুগে যুগে!

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

* ইত্তেবায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ॥
* আত্মিক বা রূহানী শক্তি বিনষ্টের কারণ ॥
* যাদের রূহানী শক্তি বিনষ্ট হয় না ॥
* তায্কীয়ার দৃষ্টান্ত : হযরত উমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

* রাহ্মাতুল্লিল আলামীন ॥
* খাতেমুন্ নাবিয়্যীন ॥

তৃতীয় অধ্যায়

* সিরাজাম-মুনীরা ॥
* সূর্যের আলো ॥
* সূর্যের উত্তাপ ॥
* সূর্যের কার্যকারিতা ॥
* মহিমময়ের মহিমা ॥
* পাথরের সাক্ষ্য প্রদান ॥
* উস্তুয়ান বা খুঁটির ক্রন্দন ॥
* বিশ্বনবী (স.)-এর সাথে এক হরিণীর কথাবার্তা বলা ইত্যাদি ॥

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন। আম্মা বাদ :

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'সিরাজাম-মুনীরা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। যার অর্থ হলো– 'উজ্জ্বল প্রদীপ'। তিনি হিদায়েতের যে আলো নিয়ে আসেন, তার ফলে গুমরাহীর অন্ধকার দূরীভূত হয়। কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়েতের আলো বিতরণ করা হবে এবং অসংখ্য-অগণিত আলোর সন্ধানী মানুষ এ উজ্জ্বল প্রদীপ থেকে আলো আহরণ করছে এবং করবে। কারণ আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আদি ও অন্তের জ্ঞান দান করেন। তিনি বলেন :

"আমি জ্ঞানের শহর এবং 'আলী এর দরজাস্বরূপ"। বিগত দেড় হাজার বছর যাবত এ বিশ্বের বুকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে সাধনা অব্যাহত আছে, তার অধিকাংশই মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে।

'সিরাজাম-মুনীরা' শব্দের আর একটি অর্থ আছে, আর তা হলো : সূর্য। অর্থাৎ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হিওয়াসাল্লাম হলেন– 'নবূওতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য।' আর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ হলেন তাঁর চারপাশে তারকারাজির ন্যঅয়।

বস্তুত: সূর্য যেমন আমাদের জাগতিক জীবনকে আলোকিত করে, তেমনিভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আলো বা হিদায়াত লাভ হয় মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণে। মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তাঁর আদর্শই একমাত্র আলোকবির্তকা; এর কোন বিকল্প নেই।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ জগতকে আলোকিত করার জন্য যেমন 'সূর্য' সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তিনি আধ্যাত্মিক জগৎকে আলোকিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন 'নবূওত ও রিসালাতের সূর্য।' আল-কুরআনে উভয় সূর্যের জন্য 'সিরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সৃষ্টি জগতে দীপ্তিমান সূর্যের অবদান অফুরন্ত। সমস্ত পৃথিবীকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরপুর করে তথা পৃথিবীকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে রাখার ব্যাপারে সূর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঠিক এমনিভাবে বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবদানও অপরিসীম। হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে : "যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তবে সারা জাহানের কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"

মূল কথা : যেভাবে সূর্য ভূবন উজ্জ্বলকারী এবং সারা বিশ্বে আলো বিকীরণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত, ঠিক যেমনিভাবে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত এবং সারা জাহানের সকলের নিকট হিদায়েতের আলো পৌঁছানোর দায়িত্ব ও তাঁর উপর অর্পিত। যারা তাঁর হিদায়েতের অনুসারী হবে, তিনি তাদের জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর যারা অবাধ্য হবে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবে না, তিনি তাদের জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী।

আল্লাহ্ আমাদের সকলকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণের তাওফিক দান করুন এবং বিনা হিসাবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন!!

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ও প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

জীবন সাধনার সাফল্যের একমাত্র পথ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : "(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

বস্তুত: জীবন সংগ্রামের সাফল্যের জন্য তথা আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য মাত্র একটি রাস্তা রয়েছে, আর তা হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ অনুসরণ। আল-কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এটিই হলো মানব জীবনের চরম ও পরম সাফল্যের একমাত্র পন্থা এবং মানব জীবনের জন্য চির মুক্তির সনদ।

এছাড়া আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা এ কথাও ঘোষণা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এক মহান দান। তাঁকে প্রেরণ করে আল্লাহ্ পাক বিশ্ব মানবতার বিরাট উপকার সাধন করেছেন। কেননা, তিনিই মানবজাতির একমাত্র আলোর দিশারী, পথ প্রদর্শক, আখিরাতের কঠিন দিনে তিনিই তাদের আশারস্থল এবং শাফা'আতকারী। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

---

১. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান-৩, আয়াত : ৩১।

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থ : "নিশ্চয় আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের আল্লাহ্র আয়াত পাঠ করে শুনান, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত; যদিও তারা এর আগে প্রকাশ্য গুমরাহীতে লিপ্ত ছিল।"[২]

আল-কুরআনের আর এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে প্রেরণের উদ্দেশ্য কি, তা ব্যক্ত করে ইরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

অর্থ : "আল্লাহ্ নিরক্ষরদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রাসূল করে প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদেরকে আল্লাহ্র আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনান এবং তাদেরকে পবিত্র করেন, আর শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। যদিও তারা ইতিপূর্বে ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় নিপতিত।"[৩]

উপরের দু'টি আয়াতে বর্ণিত 'তাদের পরিশুদ্ধ করেন' এবং 'তাদেরকে পবিত্র করেন'- এর অর্থ 'আত্মিক পবিত্রতা'। আল-কুরআনে একে 'তায্কীয়া' এবং হাদীসে 'ইহ্সান' বলা হয়েছে।

*** আত্মিক বা রূহানী শক্তি বিনষ্টের কারণ :**

উল্লেখ্য যে, রূহের জগতে আল্লাহ্র জিজ্ঞাসা : আমি কি তোমাদের রব নই? তখন রূহ্রা বলেছিল : হাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। এর দ্বারা জানা যায় যে, রূহের মধ্যে শোনার শক্তি এবং কথা বলার শক্তি আছে। কিভাবে এবং কী কারণে 'রূহের' এ শক্তি বিনষ্ট হয়, তার বর্ণনা কুরআন ও

২. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান-৩ : আয়াত ১৬৪।
৩. আল-কুরআন, সূরা জুমু'আ-৬২ : আয়াত : ২।

হাদীসে রয়েছে।

যেমন আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে কাফিরদের সম্পর্কে বলেছেন :

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থ : "কখনো নয়, বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে জং ধরিয়েছে।"[৪]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুকাতিল (র) বলেছেন : "কথাটির অর্থ হলো– না, না, আাল-কুরআনকে তারা বিশ্বাস করে না। কেননা, তাদের হৃদয় বা অন্তর সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছে, তা বিভ্রান্তির রঙে রঞ্জিত হয়েছে। পাপের কলুষ-কালিমা তাদের অন্তরে ছায়াপাত করেছে। আর তা এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের ক্ষমতা তার নেই।"[৫]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

অর্থ : "আল্লাহ্ তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন।"[৬]

আয়াতে বর্ণিত 'তাদের হৃদয়সমূহের উপর মোহর মেরে দিয়েছেন'– এর মর্মার্থ হলো। পাপী ব্যক্তি যখন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্ তায়ালা তার অন্তরে আরো পাপের কালিমা লেপন করে দেন।

ইমাম রাগাবী (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "মুমিন বান্দা যখন কোন গুনাহের কাজ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি ছোট কালো দাগ পড়ে। তারপর যদি সে তাওবা করে, পাপ থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তার অন্তর থেকে সে কালো দাগটি মুছে ফেলা হয়। তখন তার অন্তর পরিচ্ছন্ন হয়ে নির্মলরূপ ধারণ করে। আর যদি সে আরো পাপে লিপ্ত হয়, তবে সে কালো দাগটি আরো বৃদ্ধি

৪. আল-কুরআন, সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১৪।
৫. তাফসীরে মায্হারী, উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।
৬. আল্-কুরআন, সূরা বাকারা, আয়াত : ৭।

পায় ও সম্প্রসারিত হয়; এমনকি তা সারা অন্তরে ছেয়ে যায়।"[৭]

উল্লেখ্য যে, হাদীসে গুনাহগার মুমিনদের কথা বলা হয়েছে। আর এর বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় মানুষের মাঝে। যারা গুনাহ করে এবং তাওবা করে– তাদের অবস্থা; আর যারা সব সময় গুনাহ করে, কিন্তু তাওবা করে না, তাদের অবস্থা ভিন্নতর। বরং এ ধরণের পাপিষ্ঠরা সুদ-ঘুস খেয়ে, যিনা-ব্যভিচার করে, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানি, খুন-খারাবি ইত্যাদি করে প্রকাশ্যে তাদের অপকর্মের কথা বলতে একটু ও দ্বিধাবোধ করে না। আল্লাহ্ তাদের হিদায়েত নসীব করুন।

বস্তুত: মুমিন গুনাহগারদের অবস্থা এরূপ হলে, কাফির, মুশরিক, মুরতাদ, বেঈমানদের অবস্থা যে কত শোচনীয়, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের ঈমান না থাকার কারণে, তারা তাওবা করে না এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনাও করে না। তাই তাদের 'রূহ' বা অন্তর স্থায়ীভাবে জঙে ভরা। এদের সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

"আল্লাহ্ তাদের হৃদয় ও কর্ণে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর রয়েছে আবরণ এবং তাদের জন্য রয়েছে– মহাশাস্তি।"[৮]

উপরোক্ত আয়াতে বেঈমানদের অন্তরের অবস্থা 'খতম' বা 'সীলমোহর করা' দ্বারা বুঝানো হয়েছে, তারা কোনদিন হিদাযেত পাবে না এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী জীবনে তারা জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে।

*** যাদের রূহানী শক্তি বিনষ্ট হয় না :**

উল্লেখ্য যে, 'আলমে-আরওয়াহ' বা 'রূহের জগতে' আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত রূহকে এক সাথে সৃষ্টি করে, তাদের থেকে এরূপ অঙ্গীকার গ্রহণ করেন :

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا

অর্থ : "আমি কি তোমাদের রব নই? তারা বলেছিল : হাঁ, অবশ্যই আপনি আমাদের রব। আমরা সাক্ষী থাকলাম।"[৯]

---

৭. আল্-হাদীস, বাগাবী-আহমদ, নাসাঈ, ইবনে মাজা, হাকিম ও তিরমিজী বর্ণিত।

৮. আল-কুরআন, সূরা বাকারা; আয়াত : ৭।

৯. আল-কুরআন, সূরা আরাফ; আয়াত : ১৭২।

বস্তুত: দুনিয়ার এ পরীক্ষাগারে যারা এ অঙ্গীকারের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের রূহানী শক্তি বিনষ্ট হয় না। কারণ, তারা এ দুনিয়ার জীবনে পার্থিব কর্মকান্ডে লিপ্ত হলেও তাদের অন্তর থাকে আল্লাহ্‌মুখী, তারা মেনে চলে আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবন বিধান।

স্মার্তব্য যে, শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধান, হুকুম-আহকাম যথা– কালিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন তেলাওত, যিকির অজিফা, মুরাকাবা, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সবই 'রূহ' বা আত্মার খোরাক। অবশ্য এ সব আমল করার সময় হৃদয়ে থাকতে হবে আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তাঁর রহমত, তথা চিরস্থায়ী জান্নাত লাভের প্রত্যাশা।

পক্ষান্তরে, এসব আমল যদি লোক দেখানোর বা পার্থিব কোন লোভ ও লাভের জন্য কেউ করে, তবে সে এর বিনিময় আখিরাতে পাবে না। যেমন– কেউ যদি এজন্য হজ্জ আদায় করে যে, সবাই তাকে 'হাজী সাহেব' বলে ডাকবে। তবে এ হজ্জের বিনিময় আল্লাহ্‌ তাকে দেবেন না, বরং তিনি কিয়ামতের দিন তাকে বলবেন :

তুমি তো এ জন্য হজ্জ করেছিলে যে, সবাই তোমাকে 'হাজী সাহেব' বলে ডাকবে। তা তো ডাকা হয়েছে। তাই এর বিনিময়ে আমার কাছে তোমার কোন পাওনা নেই। আল্লাহ্‌ ফিরিশতাদের বলবেন : 'ওর পা ধরে উঁচু করে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ কর।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীসে এমন কিছু দাতা, শহীদ ও আলিমদের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[১০] আর এরা ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নয়, বরং তাদের নাফসের গোলামী করে। তারা জাহান্নামের কঠোর শাস্তি ভোগ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

*** তায্‌কীয়া অর্জনের উজ্জ্বলতম উদাহরণ : হযরত উমর (রা.)-এর**

১০. আল-হাদীস বর্ণিত।

ইসলাম গ্রহণ।

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ দু'আ করেন : "ইয়া আল্লাহ্! আবু জেহেল ও উমর– এ দুয়ের মধ্যে তোমার নিকট যে অধিক প্রিয়, তার দ্বারা তুমি পবিত্র ইসলামকে সম্মানিত কর।"[১১]

উল্লেখ্য যে, এ দু'আ হযরত উমর (রা.)-এর শানে কবুল হয়। হযরত হামযা (রা.) ইসলাম কবুল করার ফলে আবূ জেহেল ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। সে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্য মজলিসে ঘোষণা দেয় :

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে হত্যা করে তার মাথা আমার কাছে এনে দেবে, আমি তাকে একশত উট পুরস্কার দেব।"

পুরস্কারের লোভে উমর তরবারি হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মাথা কাটার জন্য বের হয়। হঠাৎ পথিমধ্যে নাঈমের সাথে দেখা। নাঈম তার দোস্ত। সে জিজ্ঞাসা করলো :

"কি হে উমর? খবর কি? কোথায় চলেছ খোলা তরবারি হাতে নিয়ে?"

উত্তরে উমর বললো : "সে ব্যক্তিকে হত্যা করতে যাচ্ছি, যে বলে আল্লাহ এক"।

রাগান্বিত উমর ও তার কথা শুনে নাঈম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। তার মনকে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সে বললো :

"তোমার বোন ফাতিমা এবং তার স্বামী সাঈদ ইসলাম কবুল করেছে। এ খবর কি তুমি রাখ? আগে নিজের ঘরের খবর নাও, পরে মুহাম্মদের মাথা কাটো!"

"কী!? আমার বোন ফাতিমা ইসলাম কবুল করেছে? এত বড় স্পর্ধা? আচ্ছা, আগে তার খবর নেই।"

সাথে সাথে উমর তার ভগ্নীপতির বাড়ীর দিকে ছুটলেন। উমর যখন বোনের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন সাঈদ ও ফাতিমা 'সূরা ত্বা-হা'

১১. আল-হাদীস, জামি তিরমিযী, দিল্লী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৯।

পাঠ করছিলেন। কুরআন তেলাওতের শব্দ শুনে উমর জোরে জোরে দরজা ধাক্কাতে থাকে। ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করে :

"কে দরজা ধাক্কাচ্ছে? কে?" উমর জবাব দেয় : আমি খাত্তাবের পুত্র উমর্ সে জিজ্ঞাসা করে : "তোমরা এতক্ষণ কি পড়ছিলে?" আমি জানতে পেরেছি, তোমরা বাপ-দাদার ধর্ম ছেড়ে মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছ? বেদ্বীন হয়ে গেছ!?

জবাবে সাঈদ বলে : "বাপ-দাদার ধর্মে যদি সত্য না থাকে, আর অন্য ধর্মে যদি তা পাওয়া যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না কেন?

একথা শুনে উমর তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং বেদম মার শুরু করে। ফাতিমা স্বামীকে বাঁচাতে গেলে উমর তাকেও মারধর করে। সে মারের চোটে ফাতিমার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলে, সে উমরকে বলে :

"আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছি। জীবন গেলেও আমরা তা পরিত্যাগ করবো না। তোমার যা খুশী করতে পার।"

তখন উমর নরম সুরে বলেন : "দেখি তোমরা কী পাঠ করছিলে?" ফাতিমা বলেন : "তুমি কাফির, তুমি অপবিত্র। অপবিত্র হাতে কুরআন স্পর্শ করা যায় না, তাই আগে গোসল ও পরে ওজু কর।"

উমর ওযু করলে ফাতিমা (রা.) কুরআনের সেই লিখিত অংশ তার হাতে দেন, যা পাঠ করে তিনি মুগ্ধ হন এবং বলেন : "কি চমৎকার ও কত মর্যাদাকর এ কালাম! কোথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম? আমি এখনই তাঁর কাছে গিয়ে ইসলাম কবুল করবো।"

এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আরকাম (রা)-এর ঘরে অবস্থান করছিলেন। উমর সেখানে গেলে তিনি (স.) জিজ্ঞাসা করেন :

"হে উমর! কি মনে করে আসলে? জবাবে উমর বলেন : পবিত্র দ্বীন-ইসলাম কবুল করার জন্য এসেছি। সাথে সাথে তিনি বায়'আত গ্রহণ করে পড়েন– "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত উমর (রা.) বলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ (স.)!

সত্য দ্বীন কবুল করার পর ঘরে বসে আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করবো, তা হবে না। আল্লাহ্‌র ঘরে হাজির হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলবো : আল্লাহু আকবর। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উমর (রা.)-এর জয্‌বা দেখে খুশী হন এবং আল্লাহ্‌র ঘরে হাযির হয়ে ইবাদত করার অনুমতি দিয়ে তাঁকে 'আল-ফারুক' উপাধিতে ভূষিত করেন। কারণ, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দ্বারাই হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে দেন।"[১২]

উল্লেখ্য যে, ইসলাম কবুলের পর হযরত উমর (রা.)-এর দৈহিক কোন পরিবর্তন হয়নি, হয়েছিল তাঁর মন বা কলবের পরিবর্তন। তার হৃদয়ে 'লাত-মানতের' স্থানে 'আল্লাহ্' অধিষ্ঠিত হন। একে কুরআনের ভাষায় 'তায্‌কীয়া' বলা হয়েছে, যাকে আত্মশুদ্ধি বলা হয়। আত্মশুদ্ধি ব্যতিরেকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ যথাযথভাবে সম্ভব হয় না। কাজেই এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

*** রাহমাতুল্লিল আলামীন :**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সারা জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। যেরূপ ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

অর্থ : "(হে রাসূল!) আমি তো আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।"[১৩]

বাস্তব জীবনে এর নিদর্শন দেখা যায় মক্কা বিজয়ের সময়। এ সময় তিনি তাঁর চরম ও পরম শত্রুদের ক্ষমা করে দেন। ফলে, তারা পড়ে নেয়, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী ছিলেন হিন্দা। ওহোদ যুদ্ধের দিন তিনি তার বান্ধবীদের সাথে নিয়ে যান এবং রনোম্মাদনা সৃষ্টিকারী গান গেয়ে কুরাইশ

১২. দ্রষ্টব্য: ইবনে কাসীর, ইবনে হিশাম, ইসাবা ও সীরাতে হালবিয়া।
১৩. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া-২১; আয়াত : ১০৭।

সেনাদের মনের বল বৃদ্ধি করেন। সে সময় তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রিয়তম চাচা, শহীদ বীরযোদ্ধা হযরত হামযা (রা)-এর লাশের সাথে চরম বেয়াদবী করেন।

হিন্দা প্রতিহিংসাবশত: শহীদ হযরত হামযা (রা.)-এর বুক চিরে ফেলেছিল, তাঁর নাক, কান কেটে গলার হার বানিয়েছিল এবং তাঁর বুক ফেড়ে কলিজা বের করে দাঁত দিয়ে চিবিয়েছিল। যুদ্ধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শহীদ চাচার লাশের অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েন।

এই হিন্দা মক্কা বিজয়ের দিন যখন ঘোমটায় মুখ ঢেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়সাল্লামের সামনে হাযির হয়, তখন রাহমাতুল্লিল আলামীন, দয়ার নবী তাকে জিজ্ঞেস করেননি, 'তুমি আমার শহীদ চাচার লাশের সাথে কেন এরূপ আচরণ করেছিলে? তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বলে :

"হিন্দা! তুমি আমার সামনে থেকে সরে যাও। তোমাকে দেখলে আমার চাচার সাথে যে বেয়াদবী তুমি করেছিলে, তা মনে আসে। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।"

এই অপূর্ব ক্ষমা প্রত্যক্ষ করে সে চীৎকার করে বলে উঠলো : হে মুহাম্মদ (স)! আজকের এ মুহূর্তের আগে আমার নিকট তোমার খিমার চাইতে অন্য কারো খিমা বা তাবু অধিক ঘৃণার ছিল না। কিন্তু আজ এখন থেকে তোমার খিমার চাইতে আর কারোর খিমা আমার নিকট অধিকতর প্রিয় নয়! (সুবহানাল্লাহ!)

উল্লেখ্য যে, যখন মক্কা বিজিত হলো, তখন হারাম শরীফের বারান্দায় যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়া হয়েছিল। সেখানে তাঁর উপর ময়লা ও নাপাক বস্তু নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যেখানে তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেখানে পরাজিত কুরাইশ নেতারা দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল যে ধরাপৃষ্ঠ হতে ইসলামকে মুছে ফেলার জন্য তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। এমন ব্যক্তিও ছিল– যে তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। আর সেও ছিল– যে তাঁর নিন্দা করতো। সেও ছিল, যে তাঁকে গালি দিতো। সেও ছিল– যে তাঁর

সাথে গোস্তাখী করার দু:সাহস পোষণ করতো। সেও ছিল– যে তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতো! সেও ছিল– যে তার উপর তরবারি উঠিয়েছিল। সেও ছিল– যে তাঁর আত্মীয়দের অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিল, তাদের বক্ষ বিদীর্ণ করেছিল এবং তাদের হৃৎপিন্ড ও নাড়িভুঁড়ি কেটে টুকরো টুকরো করেছিল। সেও ছিল– যে দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদের কষ্টদিতো, তাদের বুকের উপর নিজেদের অত্যাচারের অগ্নি-মোহর লাগিয়ে দিতো; তাদেরকে আগুনের মত জ্বলন্ত বালুর উপর চীৎ করে শোয়ায়ে বুকে পাথর চাপা দিতো। জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে তাদের অংগে দাগ দিতো এবং বর্শাঘাতে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করতো।

এ অপরাধীর দল সেদিন পরাজিত ও পর্যুদস্ত অবস্থায় রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। আর পেছনে দশ হাজার রক্তপিপাসু তরবারী কেবলমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের একটি ইংগিতের অপেক্ষায় ছিল।

এ সময় তিনি মুখ খুললেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : "হে কুরাইশগণ! বলো, আজ তোমরা কেমন ব্যবহার প্রত্যাশা কর।"

জবাব এলো : "মুহাম্মদ! তুমি আমাদের শরীফ ভাই এবং শরীফ ভাতিজা।" তখন রাহমাতুল্লিল আলামীন বললেন :

"আজ আমি তোমাদের তাই বলছি, যা হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর জালিম ভাইদের বলেছিলেন :

لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

অর্থ : "আজকের দিন তোমাদের বিরুদ্দে কোন অভিযোগ নেই।"[১৪]

তিনি তাদের আরো বলেন :

اِذَهَبُوْا فَانْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

অর্থাৎ "তোমরা চলে যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।"[১৫]

---

১৪. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ; আয়াত : ৯২।

১৫. আল-হাদীস বর্ণিত। মক্কা বিজয়ের দিনের ভাষণ দ্রষ্টব্য।

রাহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের এ অপূর্ব ক্ষমা দেখে সকলে স্তম্ভিত হলো। তারা আর দেরী না করে সবাই দ্বীন-ইসলাম কবুল করে পড়ে নিল : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

কত সুন্দর, কত অদ্ভুত এ বিজয়। রক্তপাত নেই, ধ্বংস, নাশকতা, বিভীষিকা নেই। প্রেম দিয়ে, পূণ্য দিয়ে মহত্ব ও ক্ষমা দিয়ে 'রাহমাতুল্লিল আলামীনের' এ বিজয়।

তাই বলা যায়, মক্কা বিজয় কোন বিশেষ একটা দেশ বিজয় নয়। এটা একটি আদর্শের বিজয়। এ বিজয় কুরায়েশদের উপর নয়, বরং মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়, অন্ধকারের উপর আলোর বিজয়; অশান্তির উপর শান্তির বিজয়।

*** খাতেমুন্ নাবিয়্যীন :**

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে যেভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে "রাহমাতুল্লিল আলামীন" বলেছেন, তেমনি তাঁকে "খাতেমুন নাবিয়্যীন" বলেও আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু নবী বা রাসূল নন, বরং তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বকালের মানুষের জন্য একমাত্র আদর্শ। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থ : "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যের কোন পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ্র রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।"[১৬]

খতমে নবূওতের অর্থ এই যে, নবূওত তার সর্বশেষ স্তরে পৌঁছেছে, এরপর আর কোন স্তর অবশিষ্ট নেই। যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খাতেমুন নাবিয়্যীন, তাই দুনিয়ার সকল নবীর, সকল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন তিনি একা, আর কিয়ামত পর্যন্ত এ পর্যায়ের যত গুণের

১৬. আল-কুরআন, সূরা আহ্যাব-৩৩; আয়াত : ৪০।

প্রয়োজন হবে, তার বিপুল সমাবেশ ঘটেছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যে। তাই তিনি ইরশাদ করেছেন :

كنت نبياوآدم بين الماءِ والطين

অর্থ : "আমি তখন নবী ছিলাম, যখন আদম পানি ও মাটি মিশ্রিত অবস্থায় ছিলেন।" অর্থাৎ যখন আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হয়নি।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

جَعَلَنِى فاتحًاَ وَّخا تمِاَ

অর্থ : "আল্লাহ্ পাক আমাকে প্রথম ও শেষ নবী করেছেন।"

বাহ্যিক দৃষ্টিতে কথাটি স্ববিরোধী মনে হয়, কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অন্য এক হাদীসে এর ব্যাখ্যা রয়েছে। তিনি বলেছেন :

كنت اول النبين فى الخلق وآخرهم فى البعث.

অর্থ : "সৃষ্টির ব্যাপারে নবীদের মধ্যে আমি সর্ব প্রথম, আর আবির্ভাবের ব্যাপারে আমি সবার শেষে।"

এতে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (স.) সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ নবী। তাঁর কারণেই আল্লাহ্ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কেননা, হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন :

لولاك لماخلقت الافلاىٔ

অর্থ : "হে নবী! যদি আমি আপনাকে সৃষ্টি না করতাম, তাহলে সৃষ্টি জগতের কিছুই সৃষ্টি করতাম না।"[১৭]

এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "আমিই শেষ নবী এবং আমার পরে আর কোন নবী হবে না। হযরত মূসা (আ.)ও যদি আজ জীবিত থাকতেন, তবে তিনিও আমার অনুসরণ করতেন। নবূওতের চির সমাপ্তি সত্ত্বেও এর মিথ্যা দাবীদার দাজ্জাল আসবে। তবে আমার পরে খলীফা জন্ম গ্রহণ করবে।"[১৮]

---

১৭. হাদীসে কুদসী– দ্রষ্টব্য।

১৮. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।

মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে শুধু আল্লাহ্ তায়ালার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল– তাই নয়, বরং তাঁর কারণে মহান আল্লাহ্ সারা জাহানের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। যেমন হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে :

فلولا محمد ماخلفت آدم ولاالجنة ولاالنار.

অর্থ : "যদি মুহাম্মদকে সৃষ্টির পরিকল্পনা না থাকতো, তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতাম না।"[১৯]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন :

"আমার দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ তেমন, যেমন কোন লোক একটি ইমারত নির্মাণ করে লোকদের তা দেখার জন্য আহ্বান করে এবং সবাই তার প্রশংসা করে বলে : 'ঐ যে একটি ইটের ফাঁক রয়েছে, সে ইটটি বসালেই ইমারতটি পূর্ণ সুন্দর হবে।" আমিই সেই সর্বশেষ ইটের ন্যায়, তাই আমার দ্বারাই নবূওতের ইমারত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।"[২০]

বিখ্যাত সুফী সাধক মাওলানা রুমী (রহ.) খতমে নবূওতের তাৎপর্য সম্পর্কে বলেছেন:

"নবূওতের যাবতীয় গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য সমূহ শেষ নবী, মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দান করা হয়েছিল। লক্ষাধিক নবী-রাসূলের যত গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, তার পরিপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছিল বিশ্বনবী (স.)-এর মাঝে। এমনকি তাঁদেরকে যত মু'জিযা প্রদান করা হয়েছিল, তাঁর সবই দান করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে, বরং তার চেয়ে আরো অধিক অনেক কিছু তাঁকে দান করা হয়েছিল।

যেমন মাওলানা রুমীর ভাষায় :

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاء داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری.

অর্থ : "হযরত ইউসুফের সৌন্দর্য, হযরত ঈসা (আ)-এর ফুঁক দেয়া, হযরত মূসা (আ.)-এর সাদা হাত– এক কথায় সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে

১৯. হাদীসে কুদসী; এটি হাকিম (র) তাঁর রচিত মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
২০. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।

যত গুণাবলী ছিল; হে আল্লাহ্‌র রাসূল (স.)! আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে তার সবই দান করেন।"[২১]

বস্তুত: সমস্ত নবী-রাসূলদের মধ্যে যত গুণাবলী ছিল, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে তা একা দান করেন। শুধু তাই নয়, বরং নবূওতের সকল গুণাবলীর মূল উৎসই ছিলেন তিনি। সূর্য যেমন আলোর মূল উৎস, তেমনিভাবে নূরে নবূওত ও রিসালাতের মূল উৎসও ছিলেন মহানবী হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

এজন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে আল-কুরআনে নবূওতের আকাশের সূর্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا.

অর্থ : "হে নবী! আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে। আর আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও দীপ্তিমান প্রদীপরূপে।"[২২]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের আদেশে, তাঁরই ইবাদাতের জন্য বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানান। যখন সারা বিশ্ব গুমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, অনাচার-ব্যভিচার তথা যাবতীয় কুকর্মই ছিল মানুষের নিও-নৈমিত্তিক কাজ। তারা তাদের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীনের পথ থেকে শুধু যে সরে এসেছিল তাই নং, বরং তারা বিদ্রোহী হয়ে পড়েছিল। তখনই দুনিয়াতে প্রেরিত হন মহানবী হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তিনি বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর হুকুম-আহকাম পালন করতে আহ্বান জানান। তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন দ্বীনের দাওয়াত থেকে বিরত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এমনকি তাঁকে আরবের সবচেয়ে বড় ধনী

২১. দ্রষ্টব্য : তাফ্‌সীরে নূরুল কুরআন, ২২ পারা, পৃষ্ঠা : ৫২।
২২. আল-কুরআন, সূরা আহ্‌যাব-৩৩, আয়াত : ৪৫-৪৬।

বা বাদশাহ হবার, বা সবচেয়ে সুন্দরী নারীর পানি গ্রহণের লোভ দেখানো হয়। কিন্তু এসব পার্থিব লোভনীয় বস্তুর কোন আবেদনই তাঁর কাছে ছিল না। তাই তিনি তাদের সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন :

"যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে বলে : হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার রবের দিকে দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত থাক; তবে তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামী আন্দোলন অব্যাহত রাখলে আরববাসী তাঁর উপর জুলুম-নির্যাতন শুরু করে। দীর্ঘ তিন বছর পর্যন্ত তারা তাঁকে তার পরিবার পরিজন ও সাহাবীসহ 'শিয়াবে আবু তালিবে' বন্দী করে রাখে।

এক পর্যায়ে তিনি তাদের জুলুম-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন।

হিজরত করে মদীনায় যাওয়ার পরও মক্কাবাসীরা তাঁকে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সুযোগ দেয়নি। তারা তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে বদর, ওহোদ ও খন্দকের যুদ্ধ পরিচালিত করে। তিনি মক্কার কুরাইশ কাফির, ইহুদী ও নাসারাদের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করে دَاعِيًا اِلَى اللّٰه বা 'আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বানকারী রূপে তাঁর দ্বীনের তথা ইসলামের আন্দোলন অব্যাহত রাখেন।' দুর্বার গতিতে পরিচালিত হয় এ সংগ্রাম। অবশেষে এ সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সার্থক হয় তাঁর জীবন সাধনা।

বিদায় হজ্জের সময় সোয়া লক্ষ সাহাবী আরাফার ময়দানে উপস্থিত হলে, তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন : "আমি কি তোমাদের কাছে আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি? তারা সমস্বরে বলেন : হ্যাঁ, আপনি পৌঁছে দিয়েছেন।" তখন তিনি দু'হাত উপরের দিকে উঠিয়ে বলেন : 'আল্লাহুম্মা আশ্‌হাদ, আল্লাহুম্মা আশ্‌হাদ।' হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন। হে আল্লাহ্! আপনি সাক্ষী থাকুন।"[২৩]

২৩. 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণ'- দ্রষ্টব্য।

এ সময় আল-কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয় :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থ : "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের উপর পূর্ণ করে দিলাম; আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম।"[২৪]

উল্লেখ্য যে, হিজরী ৬ষ্ঠ সনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'উমরাহ হজ্জ' আদায় করার জন্য মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছলে কুরায়েশরা তাঁকে বাধা দেয়। অনেক আলোচনার পর হুদায়বিয়ার সন্ধি অনুষ্ঠিত হয়, যাকে আল্লাহ্ তায়ালা 'ফত্হ মুবীন' বা 'প্রকাশ্য বিজয়' হিসাবে আখ্যায়িত করে 'সূরা ফাতাহ' নাযিল করেন। যেমন আল্লাহ্র বাণী :

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

অর্থ : "নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি।"[২৫]

স্মরণযোগ্য যে, সন্ধির একটি ধারায় উল্লেখ ছিল যে, দশ বছরের জন্য কুরায়েশ ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ স্থগিত থাকবে। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের দাওয়াত সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার মনস্থ করেন। তিনি তৎকালীন দুনিয়ার বৃহৎ শক্তিগুলোর কাছে দ্বীনের দাওয়াতপত্র নিয়ে দূত পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেন।

সে মতে তিনি বড় বড় সাম্রাজ্যের রাজা-বাদশাহদের কাছে চিঠি লিখেন। তাতে লেখা হলো : "ইসলাম গ্রহণ করে আমার নবূওত মেনে নাও। তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে সব ধরণের বিপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন।

এ সময় একটি চিঠি লেখা হয় রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের কাছে। তাঁর সামাজ্য এতো বিশাল ছিল যে, অন্যান্য রাজা-বাদশাহরা তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত থাকতো। তিনি (স.) দ্বিতীয় পত্র পাঠান পারস্য সম্রাট খসরুর কাছে। তাঁরও বিশাল সামাজ্য ছিল। তাঁকেও সব রাজা-বাদশাহরা ভয়

২৪. আল-কুরআন, সূরা আল-মায়িদা; আয়াত : ৩।
২৫. আল-কুরআন, সূরা ফাত্হ; আয়াত : ১।

করতো। তিনি (স.) আরেকটি চিঠি পাঠান মিশর অধিপতি মুকাওকীসের কাছে। তিনি (স.) অপর একটি চিঠি লেখেন বাহ্‌রাইনের বাদশা মুন্‌যির ইব্‌ন সাওয়ার কাছে। এভাবে তিনি (স.) আরেকটি চিঠি লেখেন আবিসিনিয়ার বাদশা নাজ্জাশীর কাছে।

মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিঠি পাওয়ার পর রোমক সম্রাট খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। তিনি তা তাঁর চোখে ও মাথায় বুলান এবং এ কথা মেনে নেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামই পূর্ববর্তী ঐশীগ্রন্থে বর্ণিত শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। এরপরও তিনি এ ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি যে, মুসলমান হলে তার সম্প্রদায় ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবে।

মিশরের সম্রাট মুকাওকীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পত্রের প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখান। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবে তিনি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর জন্য বিশেষ ধরণের কিছু হাদিয়া পাঠান। যাতে ছিল– দুটি বাঁদী, একটি খচ্চর এবং কিছু মূল্যবান কাপড়।

বাহ্‌রাইনের বাদশা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পত্র পেয়ে তা সসম্মানে গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হয়ে যান।

পারস্য সম্রাট খসরু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের চিঠি পেয়ে ক্ষিপ্ত হয় এবং সে তা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দেয়। এরপর সে তার গভর্নর বাযানকে নির্দেশ দেয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে গ্রেফতার করে তার নিকট উপস্থিত করতে।

গভর্নর বাযানের দু'জন দূত রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বলেন : খসরু পারভেজ? সে তো বেঁচে নেই। যাও, বাযানকে গিয়ে বল, অতি সত্তর পারস্যের রাজধানী ইসলামের রাজ্যভুক্ত হবে।

উল্লেখ্য যে, পারস্য সম্রাট খসরু রাসূলুল্লাহ (স.)-এর পত্র ছিঁড়ে ফেলে। এ খবর পেয়ে তিনি বলেন : হে আল্লাহ্‌! তুমি তার সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে দাও। ফলে তা-ই হয়।

আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পত্র দেখা মাত্র তা গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এরপর পত্রখানা প্রথমে মাথায় রাখেন, তারপর চোখে লাগান, পরে তাতে চুমু খান এবং পত্র পাঠের সাথে সাথে পড়ে নেন : "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।"

স্মর্তব্য যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের হিদায়েতের জন্য। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ : "(হে রাসূল!) আপনি বলুন : হে মানুষ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে এসেছি।"[২৬]

আয়াতের মর্মার্থ হলো : তাঁর দুনিয়াতে রাসূল হিসেবে আমার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম নেবে, তা প্রাচ্যে হোক বা প্রতীচ্যে, আরবে হোক বা আজমে, সাদা হোক বা কালো– সকলের হিদায়েতের জন্য আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আদর্শই একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ। পৃথিবীর কোন মানুষ, সে যেখানেই বসবাস করুক না কেন, যদি সে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর হিদায়েত গ্রহণ না করে এবং তাঁর অনুসরণ না করে, তবে সে সত্য পথের সন্ধান পাবে না।

বস্তুত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য প্রেরিত হন। সে জন্য তিনি সমগ্র বিশ্বে ইসলাম প্রচার না করে ক্ষান্ত হননি। দীর্ঘ তেরটি বছর অনেক কষ্ট সহ্য করে তিনি মক্কায় দ্বীন-ইসলাম প্রচার করেন। যখন কাফিরদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন তিনি আল্লাহ্‌র হুকুমে মদীনায় হিজরত করেন। এখানে আসার পরেও কাফিররা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। দশ বছরে তাঁকে ত্রিশটি যুদ্ধ করতে হয়। যার সাতাশটিতে তিনি নিজেই ছিলেন প্রধান সেনাপতি।

এভাবে তৎকালীন পৃথিবীতে তাঁর ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠ হিজরীতে

---

২৬. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ ; আয়াত : ১৫৮।

যখন মক্কাবাসীর সাথে হুদায়বিয়া নামকস্থানে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। তখন বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র প্রধানের নিকট ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে চিঠি প্রেরণ করেন। আর এভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের মানুষের কাছে মহান আল্লাহ্‌র দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দেন।

এ সময় তিনি তাঁর সোয়া লক্ষ সাহাবীকে দ্বীনের দাওয়াত প্রচার ও প্রসারের জন্য নির্দেশ দেন। আর তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু শিখেছিল, তা তাঁরা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দেন।

উল্লেখ্য যে, তাঁদের পর তাবেঈন ও তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আওলিয়ায়ে কিরাম, হাক্কানী ওলামায়ে কিরাম দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে এবং এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে– ইনশাআল্লাহ।

*** সিরাজাম-মুনীরা :**

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সিরাজাম-মুনীরা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। سراج 'সিরাজ' শব্দটির দু'টি অর্থ রয়েছে। উভয় অর্থই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, বরং এখানে সমভাবে প্রযোজ্য :

১. সিরাজ- অর্থ প্রদীপ। অতএব 'সিরাজাম-মুনীরা' অর্থ হলো– উজ্জ্বল প্রদীপ।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উজ্জ্বল প্রদীপ' বলার তাৎপর্য হচ্ছে এই যে; আমরা দেখি, একটা প্রদীপ থেকে আরো অসংখ্য-অগণিত প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়। কিন্তু চন্দ্র ও নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আরো একটি চন্দ্র তৈরি হওয়া অচিন্তনীয়, অকল্পনীয় এবং অসম্ভব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিদায়েতের যে আলো নিয়ে আসেন এবং বিতরণ করেন তা এতো ব্যাপক যে; কিয়ামত পর্যন্ত হিদায়েতের এ আলো বিতরণ করা হবে এবং অসংখ্য অগণিত আলোর সন্ধানী এ প্রদীপ থেকে আলো আহরণ করবে।

বস্তুত: বিগত দেড় হাজার বছর যাবত এ বিশ্বের বুকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে

যে সাধনা অব্যাহত আছে, তার অধিকাংশই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কেন্দ্র করে। তিনি ইরশাদ করেছেন :

اُوتِيتُ عِلَمِ الاوّلنَ والأُخِرِينى.

অর্থ : "আদি ও অন্তের জ্ঞান আমিই প্রাপ্ত হয়েছি।"[২৭]

তাঁরই নামের বরকতে, তাঁরই মহান বাণীর শিক্ষা এবং অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শের প্রচার করা হচ্ছে যুগে-যুগে, বিভিন্ন দেশে। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, বুজুর্গানে দ্বীন, সুফিয়ায়ে কিরাম এবং বিভিন্ন ভাষার পণ্ডিত ও চিন্তানায়কদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের ওয়ারেছ হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁরা এ দায়িত্ব অত্যন্ত যত্নসহকারে আজও পালন করে যাচ্ছেন।

এজন্য শুধু তাঁদেরকে কঠোর পরিশ্রমই নয়; বরং অনেক ক্ষেত্রে অবর্নণীয় ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী পেশ করতে হচ্ছে। আর এ সব শুধু এজন্যই করা হচ্ছে, যেন 'সিরাজাম-মুনীরার' আলো সর্বত্র, সর্বকালে দেদীপ্যমান থাকে।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ পাকই প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের 'নূরে হিদায়েতের' এ বিকীরণের সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। তিনিই ইমাম হুসায়নকে কারবালার রনাঙ্গণে উপস্থিত করেছিলেন। তিনিই ইমামে আজম আবূ হানীফা (রহ.)-কে বাদশাহ মনসূরের কারাগারের নির্যাতন সহ্য করার শক্তি দিয়েছিলেন। তিনিই ইমাম আহমদ (রহ.)-কে সুদীর্ঘ ২৮ মাস যাবত কারাগারে বন্দী থাকার এবং প্রতিদিন সকালে দশটি করে বেত্রাঘাত সহ্য করার শক্তি দিয়েছিলেন। তিনি হযরত গাওসুল আজম আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-কে সাধনা করার এবং ইমাম বুখারী (র.)-কে কঠোর পরিশ্রম করার তাওফিক দিয়েছিলেন। তিনি শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবীকে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিরলস সাধনা করার এবং সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র)-কে এবং ইসমাঈল শহীদ (র.)কে ঐতিহাসিক বালাকোটের ময়দানে শাহাদাত বরণ করার তাওফিক দিয়েছিলেন।

---

২৭. আল-হাদীস বর্ণিত।

বস্তুত: আল্লাহ্ তায়ালা হাজী ইম্‌দাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র)-কে তাঁর প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করার, হযরত মাওলানা কাশিম নানুতুবী (র)-কে দারুল উলুম দেওবন্দের ন্যায় বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার তাওফিক দিয়েছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-কে মাল্টা দ্বীপে বন্দী থাকার, হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.)-কে ইসলামের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করার এবং হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদে মাদানী (র.)-কে সত্য ও ন্যায়ের জন্য আজীবন সংগ্রাম করার তাওফীক দিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য যে, সত্য ও ন্যায়ের এ সংগ্রাম। এ সাধনা আজও অব্যাহত আছে। অনাগত ভবিষ্যতেও আল্লাহ্‌র অসংখ্য পেয়ারা বান্দা এ মহান দায়িত্ব পালন করে যাবেন। এ সাধনার ও সংগ্রামের স্থান-কাল-পাত্র, ক্ষেত্র ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য এক, লক্ষ্য অভিন্ন। আর তা হচ্ছে– বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কালিমায়ে তাইয়্যেবা, তথা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"-এর যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, তা যেন চিরদিন সমুন্নত থাকে। তাঁর চির সত্য আদর্শের প্রচার যেন সর্বদা বিদ্যমান থাকে। আর এটিই হলো মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে 'সিরাজাম-মুনীরা' বা 'উজ্জ্বল প্রদীপ' হিসাবে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য।

বিষয়টিকে সহজে বুঝাবার জন্য এভাবে আলোচনা করা যায়। সূর্য যেমন আমাদের জাগতিক জীবনকে আলোকিত করে, সূর্যের আলো ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নেই; তেমনিভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের আলো বা হিদায়াত লাভ হয় বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের আলোকে। আর মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের জন্য তাঁর হিদায়াত অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এ সত্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সূর্য রূপে পেশ করার তাৎপর্য বুঝতে হলে, সূর্যের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং কেন সূর্যকে প্রদীপ বলা হয়েছে তা অনুধাবন করতে হবে। তাছাড়া সূর্য মানুষের কত প্রয়োজন করে তাও জানতে হবে।

২. পবিত্র কুরআনে سراج 'সিরাজ' শব্দটি অপর যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তা হলো– সূর্য। অর্থাৎ মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন– 'নবূওতের আকাশের দীপ্তিমান সূর্য।' আর অন্যান্য নবী-রাসূলগণ হলেন– তাঁর চারপাশে তারকারাজির ন্যায়।

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এ জগতকে আলোকিত করার জন্য যেমন সূর্য সৃষ্টি করেছেন, তেমনিভাবে তিনি আধ্যাত্মিক জগতকে আলোকিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন– 'নবূওত ও রিসালাতের' সূর্য। তাই পবিত্র কুরআনে উভয় সূর্যের জন্য 'সিরাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে চারটি স্থানে سراج 'সিরাজ' শব্দটি এ দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সূরা ফুরকানে ইরশাদ হয়েছে–

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا

অর্থ : "অত্যন্ত বরকতময় সে আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান বিশালকায় গ্রহসমূহ; আর তিনি সেখানে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপী সূর্য ও আলোকময় চন্দ্র।"[২৮]

এ আয়াতে প্রদীপ অর্থ হলো সূর্য। এভাবে সূরা নূহের এক আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

অর্থ : "এবং আল্লাহ্ পাক সূর্যকে প্রদীপ রূপে সৃষ্টি করেছেন।"[২৯]

আর সূরা নাবাতে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا

অর্থ : "আর আমিই সৃষ্টি করেছি একটি দীপ্তিমান প্রদীপ।"[৩০]

বস্তুত: সূর্য সৃষ্টির মধ্যে মহান আল্লাহ্ পাকের যে বিশেষ হিকমত আছে, সে সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখা দরকার। তাহলে বিষয়টির সত্যিকার তাৎপর্য

২৮. আল-কুরআন, সূরা ফুরকান-২৫; আয়াত : ৬১।
২৯. আল-কুরআন, সূরা নূহ-৭১; আয়াত : ১৬।
৩০. আল-কুরআন, সূরা নাবা-৭৮; আয়াত : ১৩।

অনুধাবন করা যাবে।

*** সূর্যের আলো :**

সূর্যকে প্রদীপ এজন্য বলা হয়েছে যে, তার উষ্ণতা ও আলো নিজস্ব। চাঁদের জ্যোতির ন্যায় ধার করা নয়। এ জন্য আল-কুরআনের কোথাও চাঁদকে প্রদীপ বলা হয়নি, বরং আল-কুরআনের এক স্থানে সূর্যকে স্পষ্টভাবে ضِيَاءَ 'জিয়া' বা আলো বলা হয়েছে এবং চাঁদকে نوْر 'নূর' বা জ্যোতি বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا

অর্থ : "তিনিই আল্লাহ্, যিনি সূর্যকে অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চাঁদকে জ্যোতির্ময় করেছেন।"[৩১]

*** সূর্যের উত্তাপ :**

বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে, সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতার পরিমাণ ছয় হাজার ডিগ্রী সেলসিয়াস, আর তার অন্তর্ভাগের উষ্ণতা দেড় থেকে দুই কোটি ডিগ্রী সেলসিয়াস। এ জন্য তা কোটি কোটি মাইল দূরে থেকেও ভূমন্ডলকে গরম ও উজ্জ্বল রাখে। বৈজ্ঞানিকদের অনুমান, বিষুব-রেখা বরাবরের ভূ-ভাগের এক একর ভূমির উপর সূর্য থেকে দিনের বেলা যতটুকু উত্তাপ পৌঁছে, তা চার টন কয়লা পুড়িয়ে যতটুকু উত্তাপ সৃষ্টি করা যায়, ততটুকুর সমান।

*** সূর্যের কার্যকারিতা :**

যদি কেউ বিশ্বের গতিশীল নানা প্রকার জীবন প্রবাহের দিকে লক্ষ্য করে, তবে সে জীব-জন্তু ও উদ্ভিদ জগতের প্রতিটি জীবন স্পন্দনের পেছনে এই সূর্য ও তার উত্তাপ, উষ্ণতা এবং তার তেজময় আলো-বিকীরণের কার্যকারিতা দেখতে পাবে। যদি সূর্যের অস্তিত্ব না থাকতো, তাহলে আমাদের এ পৃথিবী গভীর অন্ধকারে ডুবে থাকতো, আর দুনিয়ার সব বৈজ্ঞানিক একত্রিত হয়ে তাদের সম্ভাব্য যাবতীয় উপায়-উপকরণ জমা করে

৩১. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস-১০; আয়াত : ৫।

এই পৃথিবীর সামান্যতম অংশকে ও সূর্যের আলোর ন্যায় আলোকোজ্জ্বল করতে সক্ষম হতো না। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَـٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ ۖ أَفَلَا تَسْمَعُونَ

অর্থ : "বলুন: তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ্ তোমাদের উপর কিয়ামতের দিন পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করেন, তবে আল্লাহ্ ছাড়া এমন কে আছে, যে তোমাদের আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শ্রবণ করবে না?"[৩২]

ফলে, সে অব্যাহত অন্ধকার জগতে কোন গাছ-বৃক্ষ, তৃণলতা উৎপন্ন হতে পারতো না এবং জীব-জন্তু তথা প্রাণীজগত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারতো না।

*** মহিমময়ের মহিমা :**

উল্লেখ্য যে, এ সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহিমার একটি বাতি, যা সমগ্র দুনিয়ার যাবতীয় কৃত্রিম বাল্ব বা বাতির উপর নিজস্ব পরিম-লে বিরাজমান। এ সূর্যই সমস্ত সৃষ্টি জগতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে আলো ও উত্তাপ সরবরাহ করছে এবং বিশ্ব জগৎকে জীবন-রসে সঞ্জীবিত করে রাখছে।

মহা মহিমান্বিত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের অকল্পনীয় নিয়মবিধি অনুসারে সূর্যের উত্তাপে প্রতি মুহূর্তে কোটি কোটি টন পানি সমুদ্র, মহা-সমুদ্র থেকে বাষ্পাকারে উর্ধ লোকে সদা উত্থিত হতে থাকে এবং নির্ধারিত পরিমাণ উচ্চতায় পৌঁছে তা মেঘমালার রূপ ধারণ করে, আর সেই মেঘমালা শূন্যলোকে ভাসমান অবস্থায় বিচরণ করে এবং তা বায়ুতাড়িত হয়ে দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করতে করতে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও মর্জি অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন অংশকে সিক্ত-বিসিক্ত এবং আদ্র করে দেয়; ফলে ভূ-পৃষ্ঠ উর্বর, সজীব ও উৎপাদনক্ষম হয়ে ওঠে।

বস্তুত: বিশ্ব স্রষ্টা, সারা জাহানের রব আল্লাহ্ পাকের বিজ্ঞানময় সৃষ্টি ধারার এক অতুলনীয় ও দুর্লভ নিদর্শন এই যে, তিনি সৃষ্টি জগতের প্রতিপালক

৩২. আল-কুরআন, সূরা কাসাস-২৮; আয়াত : ৭১।

হিসাবে পানি সরবরাহের জন্য সূর্যকে দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন, যা শুধু আমাদেরকে আলো ও উত্তাপই সরবরাহ করছে না, বরং তা আমাদের জন্য সাগর মহাসাগর থেকে পানিও রফতানি করছে।

এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে দীপ্তিমান সূর্যের অবদান অফুরন্ত। সমগ্র পৃথিভীকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরপুর করে, তথা পৃথিবীকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত করে রাখার ব্যাপারে সূর্যের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্মার্তব যে, ঠিক এমনিভাবে বিশ্ব সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভের ব্যাপারে বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অবদানও অপরিসীম। যেমন মহান আল্লাহ্ হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেছেন–

فلو لامحمد مَاخلقت اَدم و لاالجنة و لاالنار.

অর্থ : "যদি মুহাম্মদকে সৃষ্টি করার পরিকল্পনা না থাকতো, তবে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি হতো না।"[৩৩]

উল্লেখ্য যে, নিখিল বিশ্বের সব কিছুর সার্বিক কল্যাণ সাধনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

বস্তুত: যেভাবে সূর্য ভূবন উজ্জ্বলকারী এবং সারা বিশ্বে আলো বিকীরণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত, ঠিক তেমনিভাবে প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরিত এবং সারা জাহানের সকলের নিকট হিদায়েতের আলো পৌঁছানোর দায়িত্ব ও তাঁর উপর অর্পিত। পবিত্র কুরআনে রয়েছে এর ঘোষণা। যেমন ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

অর্থ : "হে নবী! আমি তো আপনাকে সমস্ত মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।"[৩৪]

উল্লেখ্য যে, মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের

---

৩৩. হাদীসে কুদসী; হাকিম (র) থেকে মুসতাদরাক গ্রন্থে বর্ণিত।

৩৪. আল-কুরআন, সূরা সাবা, ২২ পারা; আয়াত : ২৮।

নবূওত ও রিসালাত জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও অঞ্চল নির্বিশেষে সকলের জন্য, তাই তিনি বিশ্বনবী। তিনি সমস্ত মানব জাতিকে হিদায়েত দান করবেন। যারা তাঁর হিদায়েত মেনে চলবে, তিনি তাদের জান্নাতের সুসংবাদদাতা। আর যারা তাঁর অবাধ্য হবে এবং তাঁর আদর্শ গ্রহণ করবে না, তিনি তাদের জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী। আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

অর্থ : "হে রাসূল! আপনি বলুন: হে বিশ্ববাসী মানুষ! আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত রাসূল।"[৩৫]

বস্তুত: সূর্য যেভাবে সারা পৃথিবীর প্রতিটি অনু-পরমানুর উপর তার আলোক রশ্মি বিকীরণ করে, ঠিক তেমনিভাবে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিই প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন :

*** পাথরের সাক্ষ্য প্রদান :**

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: একবার হাযার-মাওতের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দরবারে আগমন করে, যাদের মধ্যে আশআস ইবন কায়েসও ছিলেন। তারা তাঁকে সম্বোধন করে বলে :

আমরা আপনার জন্য একটি জিনিস লুকিয়ে রেখেছি, বলুন তো সেটা কি? এর জবাবে তিনি বলেন : এসব কাজ তো গণকদের। আর তারা তো জাহান্নামে যাবে।

এরপর তারা জিজ্ঞেস করে : আপনি যে আল্লাহ্র প্রেরিত রাসূল, তা আমরা কিভাবে জানব? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে বলেন: এ পাথরগুলো সাক্ষী দেবে যে, আমি আল্লাহ্র রাসূল। এরপর তাঁর মুবারক হাতের পাথরগুলো কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো। এ আশ্চর্য ও অলৌকিক ব্যাপার দেখে তারাও বলে

৩৫. আল-কুরআন; ৭ সূরা আ'রাফ; আয়াত : ১৫৮।

উঠলো : "আমরাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।"[৩৬]

*** উস্‌তুয়ান বা খুঁটির ক্রন্দন :**

"উসতুওয়ান-ই-হান্নানাহ" ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জীবনের একটি বিশেষ মু'জিযা। মসজিদে নববী নির্মাণের পর সেখানে খুত্‌বাহ দেয়ার জন্য কোন মিম্বর ছিল না। তখন সমতল মেঝের উপর দাঁড়িয়ে তিনি খুতবাহ দিতেন। আর এ সময় তিনি খেজুর গাছের খুঁটিতে হেলান দিতেন। অষ্টম হিজরী পর্যন্ত এ অবস্থা বহাল ছিল। এরপর এক আনসার সাহাবীর গোলাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিয়ে খুত্‌বাহ দেয়ার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নবনির্মিত মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে শুরু করলে খেজুর গাছের খুঁটিটি তাঁর বিচ্ছেদে ছোট শিশুর মত কাঁদতে শুরু করে, যে কান্না মসজিদে উপস্থিত সব সাহাবী শুনতে পায়। (সুবহানাল্লাহ!)

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বাহ দেয়া বন্ধ করে মিম্বর থেকে নেমে আসেন এবং তার গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বলেন :

"তুমি জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" তখন তার কান্না থেমে যায়। (সুবহানাল্লাহ!)

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতের স্পর্শে উক্ত শুকনা গাছে প্রাণের সঞ্চার হওয়া, তাঁর বিরহ বিচ্ছেদে দু:খিত হওয়া, ক্রন্দন করা এবং তাঁর শান্তনা প্রদানে কান্না বন্ধ করা, তাঁর (স.)-এর জীবনের একটি অকল্পনীয় ও অনন্য মুজিযা।[৩৭]

*** বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স.)-এর সাথে এক হরিণীর কথাবার্তা** বলা, এমনিভাবে পাহাড়, পর্বত, গাছ-পালা ইত্যাদি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখে আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু

৩৬. আল-হাদীস, হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত।
৩৭. আল-হাদীস বর্ণিত।

আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলে সালাম পেশ করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, সমস্ত সৃষ্টি জগৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হিদায়েতের আলোকে নিজেদের আলোকিত করে। তাই আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে 'সিরাজাম-মুনীরা' খেতাবে ভূষিত করেন।

বস্তুত: সূর্যের আলো বিকীরণের কারণে যেভাবে যমীনের প্রতিটি অংশ আলোকিত হয়; তেমনিভাবে নবূওতের আকাশের সূর্য বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নূর বা জ্যোতি বিকীরণের কারণে সমস্ত পৃথিবীকে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইবাদতের স্থান হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দান করা হয়েছে, যা এর আগে কাউকে দেয়া হয়নি, আর তা হলো:

১. এক মাসের দূরত্বে অবস্থানকারী শত্রুও আমার ভয়ে ভীত হয়;

২. সারা পৃথিবীকে আমার জন্য মসজিদ তথা নামাযের স্থান এবং পবিত্রতা অর্জনের উপকরণ বানিয়ে দেয়া হয়েছে; অর্থাৎ আমার উম্মত পৃথিবীর যে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারবে এবং প্রয়োজন হলে যে কোন স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে পারবে।

৩. আমার জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তথা মালে-গণীমত হালাল করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীর জন্য হালাল ছিল না;

৪. আমাকে সবচেয়ে বড় শাফাআতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে; অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যখন কোন নবী-রাসূল আল্লাহ্র দরবারে সুপারিশ করার সাহস করবেন না, তখন সমস্ত মানব জাতির জন্য সুপারিশ করার অনুমতি আমাকে দেয়া হবে। এবং

৫. পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশেষ বিশেষ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সমগ্র মানব জাতির জন্য।"[৩৮]

---

৩৮. আল-হাদীস; বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধান যোগ্য যে, চন্দ্র ও অগণিত নক্ষত্র আকাশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও রাতের আধার দূরীভূত হয় না, সামান্য আলোর ব্যবস্থা হয় মাত্র। কিন্তু দীপ্তিময় সুর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে রাত চলে যায়। ঠিক তেমনি আধ্যাত্মিক জগতের সূর্যরূপে যিনি আগমণ করেন, তাঁর পূর্বে যত নবী-রাসূলের আবির্ভাব হয়, তাদের তাবলীগ ও হিদায়েতের কারণে সাময়িকভাবে গুমরাহী ও পথভ্রষ্ঠতার অন্ধকার দূরীভূত হয়। কিন্তু পৃথিবী পুনরায় জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অনাচারের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে।

বস্তুত: নবূওতের আকাশের মহান সূর্য মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমণের সাথে সাথে গুমরাহীর অন্ধকার কেটে যায় এবং হিদায়েতের দিন শুরু হয়। যেমন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

অর্থ : "তিনিই সেই আল্লাহ্, যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়েত ও সত্য দ্বীনসহ, যাতে তিনি দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের উপর এ দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করেন।"[৩৯]

বস্তুত: মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সারা বিশ্বের বুকে প্রভাব বিস্তার করে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরই মহান নেতৃত্বে মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হয় আরবের মরুভূমিতে, আর তিনিই ছিলেন এ বিপ্লবের মহানায়ক। সারা পৃথিবীতে আসমানী গ্রন্থরূপে একমাত্র পবিত্র কুরআনই রয়েছে, আর সবই বিদায় নিয়েছে।

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে পবিত্র মক্কা ভূমি থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে যে আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ, হিদায়েতের যে আলোক রশ্মি তিনি বিকীরণ করেছেন, তার দ্বারা আজ বিশ্বের বহু এলাকা ও জনপদ আলোকিত। তাঁর জ্ঞান দ্বারা বিশ্বের জ্ঞান-ভান্ডার সমৃদ্ধ। তাই

৩৯. আল-কুরআন, সূরা তাওবা-৯; আয়াত : ৩৩।

বিশ্ব সভ্যতায় তাঁর মহান দান অনস্বীকার্য। আর এজন্যেই তিনি 'সিরাজাম-মুনীরা' খেতাবে ভূষিত এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং প্রতিভাত।

স্মরণীয় যে, নবূওতের আকাশের সূর্য মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর সারা বিশ্বে যাঁরা ঈমানের আলোকে নিজেদের আলোকিত করতে সক্ষম হন, তারা সে আলোয় আলোকিত। কিন্তু এ আলো তাঁদের নিজস্ব নয; বরং তা হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নূর বা আলো। তিনি সত্যিকার মুমিন, তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক আছে বলেই এবং তাঁর নূরের আলোকে আলোকিত হবার কারণেই আমরা মুমিন। অতএব, আমাদের কাজ হলো তাঁর সাথে সম্পর্ককে সুদৃঢ় রাখা, তাঁর কাছ থেকে নূরের ধারা লাভে সচেষ্ট হওয়া, তথা তাঁর পরিপূর্ণ অনুকরণ ও অনুসরণ করা। যার ঘোষণা আল্লাহ্ পাক আল-কুরআনে দিয়ে ইরশাদ করেছেন :

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : "হে নবী! আপনি বলুন : যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তবে আমার অনুসরণ কর; তাহলে আল্লাহ্ তোমাদের ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।"[৪০]

অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করা এবং তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করা; অন্যথায় পূর্ণ মুমিন হওয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য যে, যেভাবে সূর্য উদিত হওয়ার পর কোন গ্রহ-নক্ষত্রের কাছ থেকে আলো লাভ করা যায় না, ঠিক তেমনিভাবে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর আর কারো নিকট থেকে হিদায়েত পাওয়া যাবে না। কারণ হিদায়েতের মূল উৎস তিনি

৪০. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান-৩; আয়াত : ৩১।

এবং তা কিয়ামতের আগ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। তাঁর অনুসরণ করা না হলে কারো আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে না। যেমন আল্লাহ্ তায়ালার বাণী :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ : "যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, কখনো তা তার থেকে কবুল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৪১]

অতএব, নাজাতের একমাত্র পথ প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ ও অনুকরণ।

উল্লেখ্য যে, সূর্য ডুবে গেলে, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্র যেমন পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখে, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর তাঁর খলীফাগণ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত উমর (রা), হযরত উসমান (রা) এবং হযরত আলী (রা) প্রমুখ সাহাবায়ে কিরাম তাঁর পূর্ণ অনুসরণে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দান করেন, ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। যাঁদের শানে নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন :

"আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা এদের মধ্য থেকে যারই অনুসরণ করবে, হিদায়েত লাভে সক্ষম হবে।"[৪২]

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: "আমি তোমাদের নিকট দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতদিন তোমরা এর অনুসরণ করবে, ততদিন গুমরাহ হবে না। আর তা হলো– ১. আল্লাহ্‌র কিতাব পবিত্র কুরআন এবং ২. আমার সুন্নতের অনুসরণ।[৪৩] এটিই 'সিরাজাম মুনীরা'র তাৎপর্য।

৪১. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান-৩; আয়াত : ৮৫।
৪২. আল-হাদীস বর্ণিত।
৪৩. আল-হাদীস বর্ণিত।